বিদ্যাঙ্গনের স্থাপত্য : শান্তিনিকেতন উদ্যোগ

শিবাদিত্য সেন*

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর যে বাসগৃহ তার নাম শান্তিনিকেতন। সেই নামেই পরে জায়গাটার নাম হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের শুরু থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু অবধি আট দশক জুড়ে শান্তিনিকেতনে যে কত বিচিত্র ধরনের বাড়ি তৈরি হয়েছে তা বলার নয়। তার মধ্যে যেমন আছে প্রায় প্রাসাদতুল্য উদয়ন, তেমনি একটা তাল গাছকে ঘিরে তালধ্বজ, শ্রীনিকেতনে গাছের উপরে কাঠের বাড়ি, মাটির ছাদ নিয়ে মাটির বাড়ি — শ্যামলী। অধ্যাপক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব জাগরণের কোনো ছাপই পড়েনি বাংলার স্থাপত্য-ভাবনায়।[১] কিন্তু সেই অভাবটা এমন উজ্জ্বলভাবে পূর্ণ করেছিল শান্তিনিকেতনের পরীক্ষা নিরীক্ষা যে আহমেদাবাদের বিশিষ্ট শিল্পপতি আম্বালাল সারাভাই, বেনারসের কৃষ্ণমূর্তি উদ্যোগ, সেখানকার রাজঘাট, কলকাতার মহাজাতি সদন বা স্বাধীনতার পরে বোকারো প্রকল্পের ঘরবাড়ি তৈরির জন্যে ডাক এসেছিল এমন এক স্থপতি — সুরেন্দ্রনাথ কর-এর যাঁর স্থাপত্য জীবনের প্রধান শিক্ষা আর দক্ষতা দুটোই গড়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনকে ভিত্তি করে।

শান্তিনিকেতনের পরীক্ষার প্রধান কাণ্ডারী, তার চালিকাশক্তি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, তাঁর প্রধান সেনাপতি সুরেন্দ্রনাথ, আর সঙ্গী শিল্পী নন্দলাল, পুত্র রথীন্দ্রনাথ। আর পরোক্ষ একটা ভূমিকা ছিল জোড়াসাঁকোর অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের। আর সেই সূত্রে সে বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে 'বিচিত্রা' উদ্যোগের।

শুরু করা যাক দেবেন্দ্রনাথকে দিয়ে। শান্তিনিকেতন নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ভাবছেন ১৮৬০ এর পর থেকে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শান্তিনিকেতনে রয়েছে তিনটে বাড়ি। পূর্বোক্ত শান্তিনিকেতন বাড়ি, গেস্ট হাউস নামটাও চালু, কারণ সেটি অতিথি নিবাস — একটা লাইব্রেরি, ছোট একতলা পাকাবাড়ি, তার কোনো ছবি বা বর্ণনা এই প্রতিবেদকের চোখে পড়েনি — আর একটা উপাসনাগৃহ, সাধারণ মানুষ তার নাম দেয় 'কাচমন্দির'।

'শান্তিনিকেতন' বাড়িটা তো পাশ্চাত্যের ডিজাইন থেকে তৈরি। Doric আর Ionic শৃঙ্খলা দিয়ে ধরা। Venetian Blinds । দক্ষিণ দিকে ঢাকা Portico, সেটা

---

* সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, চিত্রশিল্পী, চিত্রকলা ও স্থাপত্য বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক

ঔপনিবেশিক যুগের ধনীর বাড়ি। এই ধরনের বাড়ি তখন কলকাতায় বেশ প্রচলিত। বরং ঢালাই লোহা, কাচ আর মার্বেলের মেঝের যে উপাসনাগৃহ সেটা চোখ টানে। মন্দিরের মেঝে বাদে সবটাই Pre Fabricated। ঢালাই লোহার কাঠামো আর রঙিন কাচ কলকাতা থেকে এনে যথাস্থানে বসানো হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম তো হিন্দুধর্মেরই একটা ধারা — ঔপনিষদিক — এই ঘর কিন্তু কোনো 'সনাতন' হিন্দু মন্দিরের রূপ নিল না। মন্দিরটায় দেয়াল বলতে কিছুই নেই, যোলটা তার কাচের দরজা। প্রথম আশ্রমধারী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের রঙের যে খেলা আর খোলা প্রান্তরের মুক্ত যে আলো তাদের গতিপথে কোনো বাধা যেন না থাকে। তাই কাচ উপাদানটার এত গুরুত্ব। বিগ্রহের বদলে যেন আলোর বন্দনা। তাই সম্ভবত বলা যায় যে মন্দিরটার ডিজাইন নতুন একটা কন্সেপ্ট, সেটাই তার স্বাতন্ত্র, তার আধুনিকতা। নিরাকার ব্রহ্মের ভাবনাটা যেহেতু দেবেন্দ্রনাথের কাছে সক্রিয় স্বতন্ত্র একটা আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে এসেছে সনাতন ডিজাইনের কোনো পিছুটান বা দায় হয়তো সেই কারণেই তিনি অনুভব করেননি।

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শান্তিনিকেতন স্থাপত্য পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ' বইতে বলছেন, দক্ষিণ দিকের ফটকের লোহার আর্চ-এর কেন্দ্রে পেতলের ঘন্টাটি বসিয়ে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে সেটাকে যুক্ত করা হল। কিন্তু বলতে হয় আরেকটা গুরুত্বর কথা। সূর্যাস্তের রঙ আর খোলা প্রান্তরের মুক্ত আলোর যে আকর্ষণ আর মান্যতা সেটাই প্রথম জানান দিল শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যে প্রকৃতির আবাহনটাকে। পরে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় প্রকৃতির মূল্য আরও ব্যক্ত হবে। দেবেন্দ্রনাথের পরের যুগে যাবার আগে আরেকটা কথা বলে নিতে চাই।

১৮৮৭ খৃস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের আশ্রমের জন্যে একটা ট্রাস্ট তৈরি করেন। সেটাই Tagore Trust নামে পরিচিত। তাঁর ট্রাস্ট ডীডে অনেকগুলি নির্দেশ আছে। কিছু নির্দেশ তো আন্দাজ করা যায়, যেমন — আশ্রমে আমিষ আহার চলবে না, যেমন — ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম অধিনায়ক চাইবেন আশ্রমে কোনো মূর্তির পুজো করা হবে না। তাছাড়াও আরো আছে — "কোনো ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোনো প্রকার নিন্দা বা অবমাননা এই স্থানে হইবে না। এ রূপ উপদেশাদি হইবে.....যদ্দারা নীতি, ধর্ম, উপচিকীর্ষা এবং সার্ব্বজনিন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়।" এই নির্দেশগুলো তো ধর্মমুক্ত, ধর্ম-নিরপেক্ষ Secular বিধান। এই নির্দেশগুলো দেখে মনে হয় শুধু ধর্মাচরণ তথা ব্রহ্মোপাসনার বিস্তার ছাড়াও আর একটা লক্ষ্য সামনে আছে। সেটা বিকল্প একটা সমাজের সাধন। যেখানে জাগরূক থাকবে নীতিবোধ, উপচিকীর্ষা বা ভ্রাতৃভাব।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর পিতার সাধনায় "ভারতের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল।" ভারতের এই তপোবনের ভাবনাটাই শান্তিনিকেতনের বাস্তু ডিজাইনের প্রাথমিক একটা সূত্র । সেটাই ব্যাখ্যা

করে শান্তিনিকেতন বাড়িকে ঘিরে, বিশেষ করে তার দক্ষিণ অংশে বিস্তৃতভাবে প্রচুর পরিমাণে ছায়াবৃক্ষের রোপন। প্রকৃতিকে আবাহন করে করেই শান্তিনিকেতনের গড়ে ওঠা।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন তাঁর বিদ্যালয় শুরু করলেন তখন তাঁর কল্পনার বড় ভিত্তি ঐ অপোবনেরই রূপকল্প। সেটাই তাঁর বাস্তু আয়োজনের নির্দেশক। ইশকুলের নাম ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। শুরুতে তো ছাত্রদের আহারে পোশাকে হিন্দু সমাজের বর্ণভেদটা বেশ জবরদস্ত বহাল করা হয়েছিল। ১৯০১ সালের ২৩ ডিসেম্বর বা ৭ই পৌষ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সেদিন রবীন্দ্রনাথ নবীন ছাত্রদের সম্ভাষণ করেছিলেন। তুলে ধরেছিলেন ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের গৌরবটাকে। বলেছিলেন ব্রাহ্মণদের মনন আর চরিত্রের সংহতির কথা। বলেছিলেন কুটীরবাসী ব্রাহ্মণদের কাছে রাজন্যবর্গের সশ্রদ্ধ প্রণামের কথা।

যাই হোক মাথার মধ্যে কাজ করতো তপোবনের আদর্শ। ইশকুল প্রতিষ্ঠার ষোল বছর পরের কথায় সুরেন্দ্রনাথ কর তাঁর স্মৃতিচারণে বলছেন, "আশ্রম বলতে ওদিকে ঐ ছাতিমতলা আর এদিকে শিশুবিভাগ পেরিয়ে এখন যাকে বলা হয় 'নেপাল রোড' — সেই রাস্তাটা পর্যন্ত। পূর্বদিকের সীমানা ছিল সরকারি রাস্তা। আর পশ্চিম দিকে রান্নাঘরের পূর্বদিক পর্যন্ত। এর বাইরে গুরুদেবের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের 'নিচু বাংলো'। বাকি সমস্তই খোলামাঠ, কাঁটাবন বা খোয়াই ছিল.....তখন যাকে বলা হ'ত 'নতুন বাড়ী' দেহলী সংলগ্ন সেই খড়ের বাড়ীতে আশ্রমের অধ্যাপকেরা থাকতেন.....প্রত্যেকের জন্য মাত্র একখানি করে ঘর বরাদ্দ ছিল। বাড়ীর পেছন দিকে কমন রান্নাঘর ছিল। এখন যেখানে 'সিংহসদন', সেখানে সত্যকুটীরের লাইন বরাবর ছিল 'সতীশ কুটীর', 'মোহিতকুটীর', এ সবেরই খড়ের চাল মাটির দেওয়াল। অর্থাৎ কুটীরের অকৃত্রিম চেহারাটাই ছিল।"[২]

খেয়াল করা দরকার দেবেন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনের রূপ দিচ্ছেন ভাবনা হিসেবে জাতীয়তাবাদ সমাজকে আন্দোলিত করেনি। করলো, যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইশকুল গড়া শুরু করেছেন। রমন শিবকুমার যেমন বলেছেন নতুন জাতীয়তাবাদের নেতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।[৩] আরও যেটা খেয়াল করা দরকার ভারতের বিকল্পে বা তারই সম্পূরক হিসেবে আরেকটা ভাবনা তাঁর কাছে একই সঙ্গে গড়ে উঠছে, সেটা হল স্বদেশ-এর ভাবনা — সেটা অনেক নমনীয়। সেটা অঞ্চল নিয়ে হতে পারে, রাজ্য নিয়ে হতে পারে আবার দেশ নিয়ে হতে পারে। তাতে যেমন থাকতে পারে "জনগণমন অধিনায়ক" তেমনি স্থান পেতে পারে "আমার সোনার বাঙলা"র মত গান। আসলে ইতিমধ্যে আরেকটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেছিল। সেটা বেশ প্রাসঙ্গিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল পূর্ব বাংলার কটা জমিদারির দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব নিয়ে তিনি যান সেইসব এলাকায়। জমিদারির তদারকির সূত্রেই খুব কাছ থেকে দেখতে পান গ্রামের মানুষদের, আর তাদের জীবনযাপন। প্রাচুর্যের বিপরীতে নিরাভরণ বিরলতা ভিত্তিক মানুষের — গ্রামের

মানুষের সাংসারিক আয়োজন। স্বদেশের একটা লৌকিক রূপ তাঁর কাছে ধরা দিল। খেয়াল করতে পারি তপোবনের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "তপোবনের যে চিত্রটি রয়ে গেছে.....সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্ত্তি, বিলাসমোহমুক্ত।" (কল্যাণের এই প্রসঙ্গ আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারে দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে নীতি, ধর্ম্ম, উপচিকীর্ষা এবং সার্ব্বজনিন ভ্রাতৃভাবের কথাটা)। পুর্ববাংলায় গিয়ে, থেকে আর যেটা অনুভব করলেন সেটা প্রকৃতির অপূর্ব বিস্তার। প্রকৃতি জিনিসটা তাঁর মননে পাকা বাসা নিল।

'শান্তিনিকেতন' বাড়ি ছেড়ে থাকবার জন্য যখন তৈরি করলেন দেহলী বাড়ি — চোখে পড়বার মত তার মেদহীন functional চেহারা। জমিদারি জাঁক তাতে নেই। ঘেরা তার বারান্দা আর আধখোলা তার ছাদ — সেই উন্মুক্ততায় প্রকৃতির সাদর স্বীকৃতি।

এখানে বলে রাখা দরকার অধ্যাপকদের জন্য আশ্রমের 'নতুন বাড়ী' বা একাধিক ছাত্রাবাসের যে মাটির দেওয়াল খড়ের চাল তার একটা কারণ অবশ্যই আর্থিক। সুরেন্দ্রনাথ বলছেন "কোনার্ক" বাড়ীটা তৈরী হবার আগে সেখানে একটা মাটির বাড়ীতে গুরুদেব থাকতেন। ..... এরই কাছে মীরা দেবীর থাকবার জন্য কাঁচা ইঁটের দেওয়াল, খড়ের চাল আর দরমার তৈরী দরজা জানালা দিয়ে একটা বাড়ী করা হয়েছিলো।"[৪] (এখানে বলে রাখি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বাড়ি বা দেহলী বা কোনার্কের এই রূপের উল্লেখ — মূল্যবোধ, ভাবনা আর রুচির বদলের প্রসঙ্গে। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে ব্যক্তিগত আবাসের আলোচনা থাকবে না — আর থাকবে না উদয়ন, উদীচি, কোনার্ক বা মালঞ্চর কথা। থাকবে শুধু বিদ্যাঙ্গনের ঘরবাড়ির কথা - প্রাক স্বাধীনতা পর্বে।)

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির পরিবর্তন হচ্ছে অন্যদিকেও। পল্লী জীবনের সংস্পর্শে আউল বাউল ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। শান্তিনিকেতনেই পরিচিত হচ্ছেন মধ্যযুগের সন্ত সাধকদের সঙ্গে। এমন একটা ভারতকে ভাবনায় দেখতে পাচ্ছেন যেটা জাতি-বর্ণ-ধর্মর কাঠামোর থেকে বিস্তৃততর। ১৯১০ সালে লিখছেন 'গোরা' । গোরা তো খুঁজছেন সেই দেবতাকে যিনি শুধু হিন্দুর নন সমগ্র ভারতবর্ষের দেবতা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় দেখছি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন কবীরের দোঁহার, প্রকাশিত হচ্ছে 100 Poems of Kabir। কোনো একটা সময়ে বিদায় নিচ্ছে তাঁর ইশকুলের বর্ণভেদ ব্যবস্থা।

কলকাতায় ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে Indian Society of Oriental Art — তার নেতা তাঁর তিন ভাইপো — সমরেন্দ্র, গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ। এই মঞ্চটার লক্ষ্য ঔপনিবেশিকতার উলটোদিকে একটা ভারতীয় শিল্পভাষা, বিষয় আর রুচির অনুসন্ধান আর নির্মাণ। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করবার মত সেটা হল ভারতের শিল্পচর্চায় ঐতিহ্যের ভাবনাটার ক্রমব্যাপ্তি। যে শিল্প সংগ্রহ তারা করছেন (তার ক্যাটালগ্ তৈরি করেছিলেন যুগ্মভাবে আনন্দ কুমারস্বামী আর নন্দলাল বসু) তাতে

যেমন আছে সাবেকী দাক্ষিণাত্যের ব্রোঞ্জের মূর্তি, তেমনি রাজপুত কাংড়া আর মধ্যযুগের মুঘল অনুচিত্র। এখানেই ছাত্র হিসাবে যুক্ত হচ্ছেন নন্দলাল বসু, মুকুল দে। কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ কর এখানেই তালিম নিচ্ছেন নন্দলাল আর অবনীন্দ্রনাথের কাছে। এখান থেকেই নন্দলাল, অসিত হালদার, মুকুল দে ভগিনী নিবেদিতার প্রণোদনে অজন্তার ঝোপঝাড় আর বুনো জঙ্গলে ঘাঁটি করে তার স্থাপত্য ভাস্কর্য দেয়ালচিত্র অনুকরণ আর দলিল তৈরি করছেন। এখানেই দীর্ঘ দিনের অতিথি হয়ে বাস করছেন আনন্দ কুমারস্বামী।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছেন জাপান। জাপানবাসীর জীবনযাত্রার অন্তত দুটো দিক তাঁকে বড় করে নাড়া দিল। এক, তাদের ডিজাইনে স্থাপত্য থেকে শুরু করে প্রতিদিনের আসবাব সম্ভারে আড়ম্বরহীনতার বিরলতার বিস্তার আর অন্যটা হল প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনে সৌন্দর্যের নীরব উপস্থিতি। জাপান থেকে অবনীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখছেন "আমাদের দেশে আর্ট এর হাওয়া বয়নি, সমাজের জীবনের সঙ্গে আর্টের কোনো নাড়ীর যোগ নেই - - -। - - - এখানে একবার এলে বুঝতে পারতে এরা সমস্ত জাত এই আর্টের কোলে মানুষ।"[৫] আর সেই সঙ্গে অর্জন করছেন একটা অভিজ্ঞতা — অন্ধ জাতীয়তাবাদের জঙ্গী আগ্রাসন।

১৯০১ সালে ইশকুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিছুদিন বাদে ক্রমে মনে হতে থাকে শিক্ষায় শিল্পের স্থান আছে শুধু তাই নয় তার স্থানটা কেন্দ্রীয়। প্রথম দিকে ড্রয়িং মাস্টার গোছের কেউ কেউ বিদ্যালয়ে যুক্ত হয়েছিলেন — ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মনের বর্ণনায় মাটির কলসি কুঁজোর নকল আঁকা শেখাবার মাস্টার।[৬] রবীন্দ্রনাথ চাইছেন আরও গভীর ভাবনার শিক্ষক। এইভাবে পাচ্ছেন অসিত হালদার আর সুরেন্দ্রনাথ করকে। সুরেন্দ্রনাথ এলেন ১৯১৭ সালে। ২৩ বছরের তরুণ। সঙ্গে এনেছেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে পাঠ — বাংলা ঘরানার রুচি। তাতে নাগরিক স্থাপত্যবর্ণনায় সূক্ষ্ম সরলরেখা, আর পরিশীলিত অলঙ্করণের ব্যবহার।

ততদিনে সম্ভবত জাহির হয়েছে আনন্দকুমারস্বামীর একটা প্রত্যয় "চারুকলা ও প্রয়োগশিল্প এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য ভারতীয় ঐতিহ্যে ছিল না। যা নিত্য ব্যবহারের জিনিস, যেমন বাসস্থান বা আসবাব আর যা কেবল বিশুদ্ধ কলাকৃতি এই দুই এর মধ্যে বিভেদ অজানা ছিল।"[৭] এই রকম ভাবনা স্বাধীনভাবে বৃটেনে চর্চা করেছেন বহু গুণে গুণী যে William Morris তাঁর ভাবনার সঙ্গেও তখন শিল্পগুরুরা সম্ভবত পরিচিত ছিলেন।

বোলপুর শান্তিনিকেতনে পেশাদার স্থপতি নেই। আর্থিক একটা ব্যাপারও আছে। ক্রমপ্রসারমাণ বিদ্যালয় ব্যবস্থায় স্থপতির দায়িত্বটা রবীন্দ্রনাথই সুরেন্দ্রনাথকে বললেন নিতে — সুরেন্দ্রনাথ নিলেন সেই দায়িত্ব। শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যের ইতিহাসে শুরু হল নতুন এবং নবীন এক অধ্যায়। স্থাপত্যের ভার অর্পণটা প্রথমে সম্ভবত তত নাটকীয়ভাবে হয়নি। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পূর্ত বিভাগের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু ১৯১৮ সালেই ছাত্রদের প্রয়োজনে একটা বড় কুয়োর

দরকার হয়েছিল। বিহারের মুঙ্গের অঞ্চল থেকে কারিগর এনে সেই কুয়ো বসান সুরেন্দ্রনাথ। সেই কুয়োর বাঁধানো পার। ব্যবহারের দাবির অতিরিক্ত একটা অলঙ্করণ তাতে যুক্ত হয়েছিল। পর পর করতে হয়েছিল ছেলেদের জন্যে একাধিক হস্টেল তথা ছাত্রাবাস। শমীন্দ্র কুটীর আর সত্য কুটীর হচ্ছে ১৯১৮ সালে, সন্তোষালয় ১৯১৯-এ। (এর আগে মীরা দেবীর যে মাটির বাড়ির কথা বলা হয়েছে সেগুলোও তৈরি হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে।)

ক্রমশ বোঝা যেতে লাগলো মাটি খড় বা টালির মতন কম দামী উপকরণের উপর আর নির্ভর করা যাবে না, যাবে না বিদ্যালয়ের ক্রমপ্রসারের দাবিতে। ১৯১৯ সালে কলাভবনের পত্তন। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর। পাকাপোক্ত বাড়ি দরকার। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে জাতীয়তাবাদকে ধারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার আকর্ষণ ইতিমধ্যে ফিকে হয়ে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর জাপানের রণহুঙ্কারের অভিজ্ঞতায়। কিন্তু একটা দেশাভিমান তাতে কিন্তু নষ্ট হয়নি। বরং অন্য মাত্রা পেয়েছে। বিশ্বকে ভারতের যে কিছু দেবার আছে এই একটা তাড়না জন্ম নিচ্ছে। তাঁর বিশ্বভারতী প্রবন্ধসংকলনের প্রথমটা শুরু করছেন এই ভাবে— "মানবসংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।"[৮] এই তাড়নাটাই হয়তো একটা ভারতীয় স্থাপত্যের সন্ধানকে উস্কে দিয়েছিল। অবনীন্দ্র গগনেন্দ্রর সংগ্রহে শিল্পকর্মের যে সংগ্রহ, তাতে মধ্যযুগের স্থাপত্যের একটা আভাস পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী যুগের বলতে আছে হয়তো অজন্তা আর ১৯২১ সালে বাগগুহার কপি। ফোটো বই এর অভাব। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে জানছি, "সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সহচর হিসেবে নানা প্রাচীন স্থাপত্যসমৃদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করেন, যেমন ১৯১৯ সালে মাদ্রাজ প্রদেশে, ...১৯২৭ সালে জাভা ও বালিদ্বীপে।.... রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখছেন যে সুরেন করকে পাঠানো হল মৈসুর থেকে মাদুরায়, মন্দিরগুলি ভাল করে দেখে আসতে। .... তা ছাড়া জানা যাচ্ছে যে ১৯১৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ কর অবনীন্দ্রনাথ ও মুকুল দে'র সঙ্গে কাশী সারনাথ এবং ১৯১৯ সালে নন্দলাল বসুর সঙ্গে রাজগীর, নালন্দা, বুদ্ধগয়া ইত্যাদি স্থানের স্থাপত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়েছিলেন।"[৯] সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন "তিনি (গুরুদেব) এমন করে ভারতবর্ষের নানা ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান, দেশে বিদেশে নানা দ্রষ্টব্য দেখবার সুযোগ করে দিয়েছেন আপন আগ্রহে...যাতে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়।"[১০]

তপোবনের রূপকল্পটা ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর A Poet's School প্রবন্ধে লিখছেন "... today the idea of Tapovan has lost all semblance with reality and faded into realm of legend, unless remade under modern conditions of life."

এটা কাকতালীয় নাকি সম্পর্কিত — ৩পোবনের রূপকল্পটা যখন ঝাপসা হয়ে আসছে তখন তার জায়গা করে নিচ্ছে বৌদ্ধবিহারের, বৌদ্ধ স্থাপত্যের নানা রূপকল্প? বৌদ্ধবিহার জ্ঞানপীঠের আরেক ধরনের ঐতিহাসিক স্মৃতি। শুধু তো বিহার নয়, স্তূপগুলো থেকেও আহৃত হচ্ছে ডিজাইন। প্রসঙ্গত মনে করতে পারি গৌতম বুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠমানব বলে অন্তরে ভেবে এসেছেন। বুদ্ধকে তুলনা করেছিলেন সেই নক্ষত্রর সঙ্গে যে নক্ষত্র নিভে গেছে কিন্তু তার আলো এখনও পুরোপুরি এসে পৌঁছোয়নি।

সুরেন্দ্রনাথের প্রথম স্বাধীন নির্মাণ — আমরা যেটাকে বলি ঘন্টাতলা তার ঘন্টা পীঠটি তৈরি করলেন যে ডিজাইনে সেটি সাঁচিস্তূপের তোরণ থেকে আহৃত। তেমনি ছাতিম তলায় ছাতিম গাছকে ঘিরে যে বেড়া সেটাও সাঁচির পাথরের বেড়া থেকে আহৃত। এখানে বিষয়ান্তরে একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ছাতিম তলার ছাতিম গাছ দুটি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রম রচনার একদম কেন্দ্রে রয়েছে। তাদের ঘিরে যে স্মারকটা তৈরি হল তাতে কোনো জাঁক নেই। স্থাপন করা হয়নি তখনকার কলকাতার অন্যতম এক ধনীর বৈভবের চিহ্ন। দীর্ঘ নিরাভরণ নিচু একটা বেদী। তার ওপর ছাতিম গাছকে সুরক্ষিত রাখা। তার স্থাপত্য দৃষ্টিকে বাধা দেয় না। প্রকৃতির সঙ্গে সুসংহতিতে সেটা মিলে যেতে পারে।

এখানে এগোবার আগে আশ্রমের ছকটা একবার খেয়াল করে নিই। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম উদ্ধৃত স্মৃতিচারণে বর্ণিত আছে আশ্রমের চৌহদ্দিটা। শান্তিনিকেতন বাড়ি ধরে উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে একটা কাঁকুড়ে রাস্তা। আবার দেহলি থেকে শালবীথির পাশ দিয়ে পুরনো রান্নাঘরের কোণ দিয়ে আরও কয়েকশো মিটার এগিয়ে চলে গেছে একটা রাস্তা। এই দুটো রাস্তা আশ্রমকে করেছে চার ভাগ। চারটে চতুষ্কোণ বলা যায়। এই চার ভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম চতুষ্কোণে ঐ ছেদকারী দুই রাস্তা ঘেঁষে একটা বড় চত্বর। সেটার নাম গৌড়প্রাঙ্গণ।

গৌড়প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিমে একটা গ্রন্থাগার ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে গ্রন্থাগারটি দেখেছিলেন সেটি সম্ভবত এইটিই। একতলা বাড়ি। তার ওপর দোতলায় একটা মাটির ঘর তৈরি করা হয়েছিল। সেটা যখন ভেঙে পড়লো তখন ঠিক হল যে এবার গোটাটাই একটা পাকা দালান করতে হবে। আমরা যে গ্রন্থাগারটা পেলাম, যেটাকে বরাবর লাইব্রেরি বলে এসেছি, সেটা এখন পাঠভবনের দপ্তরখানা। কিছু ক্লাস হয়। দোতলা বাড়ি। এক তলায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে দক্ষিনমুখো ঢাকা একটা বারান্দা। তার পর টানা একটা করিডোর। তারপর কয়েকটা বড় ঘর। তার পেছনে আবার একটা খুব বড় ঘর। এই ঘরগুলোতেই নানান বিন্যাসে বই রাখা হোত। দোতলার সামনের দিকটায় ঘর করা হয়নি। নিচে যেটা ঢাকা বারান্দা দোতলায় সেটার ওপরে মুক্ত আকাশ। তার মেঝেটাকে ঘিরে বসবার জায়গা চতুষ্কোণের তিন দিক নিয়ে। করিডোর রেখে এক সার ঘর। ওপরেরই একটা ঘর ছিল ক্ষিতিমোহন সেনের Study। দোতলায় উঠলেই বোঝা যায় দোতলার

মেঝে একটাই নয় — Split level — তল ভাঙা। এই তল ভাঙাটাই ছাদে, কোথাও মেঝেতে, সুরেন্দ্রনাথের বাগধারার একটা অংশ বা Signature হয়ে যাবে। নিচের তলায় ফিরে আসি। ঐ যে ঢাকা বারান্দা ক্লাসের দিনগুলোর শুরুর বৈতালিকের গান নিয়মিত ঐখানেই হয়। ঐ বারান্দাটাই আবার সন্ধ্যেবেলার আধখোলা মঞ্চ। এই প্রতিবেদক তার স্কুল জীবনে ওই মঞ্চে ইশকুলের নাটক হতে দেখেছে। আটের দশকের গোড়ায় সন্ধ্যায় সেতার বাজিয়েছেন নিখিল ব্যানার্জী, নয়ের দশকে রবিশঙ্কর। এইবার এগিয়ে যাই ঘরগুলোর দিকে। মঞ্চর পেছনের করিডোরটা নজর করলে দেখবেন দুধারে দুটো বড় বড় থাম। চিনতে অসুবিধা হবে না। থাম দুটোয় অজন্তার প্রভাব। এবারে সেই বাড়ির বাঁদিকের দরজা দিয়ে বাঁদিকের বড় ঘরটায় ঢুকুন। দেখবেন ছাদের ঠিক নিচে চার দেওয়াল জুড়ে একটা অলঙ্করণ। পদ্মফুল, তার কুঁড়ি, হাঁস, অপরিচিত পাখি আর খেলায় রত বাচ্চা ছেলেদের নিয়ে চার দেওয়াল জুড়ে একটা Scroll। নন্দলালের রচনা, হাত লাগিয়েছেন ছাত্র বিনোদবিহারী আর গৌরী (নন্দলালের বড় মেয়ে)। এও তো অজন্তা থেকে আহৃত। আসলে নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ দুজনেই অজন্তায় মুগ্ধ। নিবেদিতা যাঁদের অজন্তায় পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন না। কিন্তু ১৯১৪ সালে জগদীশচন্দ্র নন্দলাল সুরেন্দ্রনাথকে ভিত্তিচিত্র আঁকতে আমন্ত্রণ জানালে সুরেন্দ্রনাথ যে কটি ছবি আঁকেন তার মধ্যে একটি ছিল অজন্তার অনুরূপ একটা নকশা। ১৯১৮-১৯ এ আদিকুটীরের গায়ে এঁকেছিলেন মা, শিশু ও বুদ্ধ। অজন্তা অবহিতদের কাছে বিষয়টা মনে হবে চেনা চেনা। ঐ বাড়িটা আর নেই। শিবকুমার শান্তিনিকেতনের ভিত্তিচিত্রের ক্যাটালগে উল্লেখ করেছেন ওই ভিত্তিচিত্রে ব্যবহৃত হয় "Ajanta Technique"। একটু প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলি ঐ যে বিরাট বাড়ি লাইব্রেরি, অনেকগুলো বড় বড় ঘর, দোতলাতেও ততটাই বিস্তার — বাড়িটাকে Imposing মনে হয় না। তার একটা কারণ সামনের গৌরপ্রাঙ্গণ আর একপাশে শালবীথির বিস্তার। পরিসর আর প্রকৃতির শান্তিনিকেতন স্থাপত্যে বড় অবস্থান। তার মধ্যে ঐ বাড়ি একটা অনুভূমিক — horizontal form-এ আছে বলে মুক্ত আকাশের দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে ওঠে না। এই অনুভূমিকতাই শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যের ইডিয়মে বড় স্থান করে নিয়েছিল।

বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রসঙ্গে বলি উত্তরায়ণ থেকে ছাতিমতলাকে বাঁদিকে রেখে উত্তর-দক্ষিণে যে রাস্তা গেছে আর দেহলী শালবীথির পাশ ধরে পূর্ব-পশ্চিমে যে রাস্তাটা আশ্রমের সীমানা পার হয়ে গেছে সঙ্গীতভবনের দিকে, এই দুই রাস্তার কাটাকুটিতে রান্নাঘরের দক্ষিণে একটা অদ্ভুত স্থাপত্য আছে। মধ্যে একটা ছোট উঁচু ঘর, মাটির দেওয়াল মাটির ছাদ। তাতে একজন মানুষ দাঁড়িয়েও থাকতে পারবে না। ঐ ঘরের দুদিকে দুটো 'ডানা' — মাটির। নন্দলালের ডিজাইন। সুরেন্দ্রনাথ দুই ছাত্রকে নিয়ে কাজটা করেন। ঐ ঘরের মধ্যে একটা তাক, তাতে সপ্তাহে সপ্তাহে বদলে বদলে কলাভবনের ছাত্ররা তাদের হাতের কাজ দেখাতো, অথবা রাখা থাকতো কোনো মাস্টারপিসের ছোট অনুকরণ। ঐ স্থাপত্যের নাম দেওয়া হয়েছে চৈত্য। ছাত্ররা

যেমন সেখানে তাদের কাজ শেয়ার করছে, তেমনি হচ্ছে আর একটি কাজ। সেটি নন্দলালের বিশেষ করে প্রিয়। সেই যুগের নাগরিক মধ্যবিত্ত রুচিতে ক্ষুব্ধ নন্দলাল। সেই রুচির উন্নতির জন্য কি আয়োজন দরকার? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নন্দলাল যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন — 'শিক্ষায় শিল্পের স্থান' তাতে করণীয়র মধ্যে প্রথমেই বলেছেন "ছেলেদের বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে, পড়ার ঘরে এবং বাসগৃহে কিছু কিছু ভালো ছবি মূর্ত্তি এবং অন্যান্য চারু ও কারু শিল্পের নিদর্শন সাজিয়ে রাখতে হবে।"[১১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় জাপান থেকে অবনীন্দ্রনাথকে চিঠিতে শিল্পসৌন্দর্য্য থেকে 'আমাদের দেশের' যে বিযুক্তির ক্ষোভটা জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই অভাববোধটা ততটাই বিচলিত করতো নন্দলালকে।

কিন্তু চৈত্যে ঐ মধ্যের ঘর ছাড়াও আরও বেশি কিছু ছিল। তার উত্তর আর পুব দিক ধরে দেয়ালের নিচে ধাপ করে বসার জায়গা। পেছনে অর্থাৎ পশ্চিম মুখে আরো প্রশস্ত বসবার জায়গা। তেমনি বসার জায়গা রয়েছে পূর্বোক্ত ঘন্টাতলাকে ঘিরে। বসার জায়গা যে লাইব্রেরির দোতলায় খোলা ছাদটাতেও ছিল সে কথাটা আগেই উল্লেখ করেছি। আশ্রম বদলে হচ্ছে তপোবন, তপোবন বদলে হচ্ছে বিশ্বভারতী। এই সবের মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশিত 'ভ্রাতৃভাব'টাকে যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে শুধু বাড়িতে বা হস্টেলে নয় ব্যাপকতর অর্থে আশ্রম এলাকায় নানা ধরনের আদান প্রদান ভাব বিনিময়ের আয়োজন রাখতে হয়। আজকের ভাষায় Public Space। যেখানে ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে অথবা অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনায় তর্কয় প্রশ্নোত্তর আর সমালোচনায় মিলিত হতে পারবেন। চৈত্যর কাচে ঘেরা তাকে ছাত্রদের কাজ সাজানোর আয়োজনটাও তো ঐ রকম বিনিময়েরই আরএকটা উদ্যোগ। এই প্রবন্ধের এই অংশটার শেষভাগে public space এর আরেকটি উদাহরণ আসবে।

বৌদ্ধ স্থাপত্য-ভাবনায় চৈত্যের একটা বিশিষ্ট স্থান। বিশিষ্ট তার পরিচয়। পেছন দিকে কেন্দ্রে একটা স্তূপ। তাকে ছাদ দিয়ে যে বড় হলঘর সেটাই চৈত্য। এই চৈত্যর ভাবনার ভিত্তিতে একটা বিশেষ ডিজাইন অজন্তা আর ইলোরায় গড়ে উঠেছিল। সেটা হল কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে। তার পর একটা ঢাকা বারান্দা। তার দু ধারে বসার জায়গা থাকতেও পারে। তার পর একটা বড় হলঘর। আজকের যুগে এই রকম হলঘরে ক্লাস হতে পারে, বক্তৃতা হতে পারে, হতে পারে কোনো সমাবেশ। এই ছকটাই নানান scale আর বৈচিত্র্যে শান্তিনিকেতনে স্থাপিত হয়েছে। একটা Idiom এর রূপ নিয়েছে। তার একটা ছোট চেহারা পাই কলাভবনের ছেলেদের হস্টেলের উত্তর-পুবের একটা বাড়িতে। বেশ ক'ধাপ সিঁড়ি উঠে একটা বারান্দা। তার সামনে আর দুপাশে ঘর। বারান্দার ছাদ আর সামনে ও দুপাশের দেওয়ালে ভিত্তিচিত্র। অজন্তার কোনো একটা গুহার প্রবেশ বলে মনে হতে পারে। এই যে ধাঁচ বা ছক ফিরে তাকালে মনে হতে পারে এটাই ব্যবহৃত হয়েছিল আলগোছা লাইব্রেরি বাড়িটায়। সেই নকশাটারই রকম ফের, আকার ফের চীন ভবন, হিন্দি ভবন, নন্দন

আর মাস্টারমশাই (নন্দলাল) এর কলাভবনের স্টুডিও।

ফিরে যাই আশ্রম এলাকায়। লাইব্রেরির সামনে বিস্তৃত গৌরপ্রাঙ্গণ। গৌরপ্রাঙ্গণের দক্ষিণ সীমারেখার মাঝ বরাবর সিংহ সদন। রায়পুরের জমিদার সত্যেন্দ্র নারায়ণ সিংহের অনুদানে তৈরি। সভা সমাবেশের জন্য সম্ভবত প্রথম একটা বড় আয়োজন। প্রতিসাম্যে তৈরি। মুখোমুখি সামনে এসে দাঁড়ালে বিরাট একটা দরজা। তার দুধারে দুটো এগিয়ে আসা দেওয়াল। কিন্তু তাদের বাইরের দিকটা উল্লম্ব নয়। একটা ঢাল নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের ভিতর দিকে ওপর থেকে নিচ অবধি অনেকগুলি কুলুঙ্গি দরজাটার দুপাশে। একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে এটার নকশার উৎস মধ্যযুগের একটা মসজিদ। উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের পঞ্চদশ শতাব্দীর অটলা দেবীর মসজিদ। অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সালে শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যে স্থান করে নিচ্ছে উত্তর ভারতের মধ্যযুগের ইসলামিক নকশা। বাড়ির ডিজাইনের প্রতিসাম্যটা অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। কারণ বাঁদিকের সামনে থেকে উঠে গেছে একটা ঘর। সেই ঘরের উপরে চারটে থাম বসানো, তাদের মাথায় ছাদ। সেখানেই বিদ্যাঙ্গনের প্রতিদিনের ক্লাস শুরু, ক্লাস শেষ, সভা উপাসনার জানান দেবার ঘন্টা বসানো হবে। শেষের ঐ ঘর বা ছাদের গা থেকে কিছু দূর অন্তর অনুভূমিক কার্নিস আর ব্র্যাকেট। এইভাবে একটা আকারের বাড়তি 'লম্বতা'কে ভাঙেন সুরেন্দ্রনাথ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন লম্বতা কে এই ভাঙ্গার ভাবনাটা সুরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন জাভা বালিদ্বীপ থেকে। কিছুদিন আগেই সে অঞ্চল তিনি ঘুরে এসেছেন।

সিংহ সদনের দুই ধারে খানিকটা ফাঁক রেখে সরল আকারের দুটো বাড়ি, আসলে দোতলা দুটো ঘর। পূর্ব ও পশ্চিম তোরণ। দুটো তোরণেরই দরজা ইসলামিক ধারার। যাঁরা জৌনপুরের পূর্বোক্ত ঐ মসজিদ বা তার ছবি দেখেছেন তাঁরা খেয়াল করবেন সেখানেও আছে ঐভাবে দুটো ঘর, কিন্তু ঘর দুটো মূল অংশটায় জোড়া। অখণ্ড একটা বিস্তারের অংশ। গৌরপ্রাঙ্গণে তোরণ দুটোকে বিচ্ছিন্ন করে একটা বাড়তি বিপুলতা এড়ানো গেছে। তারও পরে দুধারে দুটো কুটীর নিয়ে ঐ দুই তোরণ আর মধ্যেকার সিংহ সদনটাকে সাজিয়ে বেশ বিস্তারে একটা প্রতিসাম্যে পুব-পশ্চিম বরাবর পরিসরটাকে (Space) সুরেন্দ্রনাথ ভেঙে নিয়েছেন। গৌরপ্রাঙ্গণ পার হয়ে দক্ষিণে গেলে বাঁদিকে চীন ভবন। অত্যন্ত সরল সামান্য অলঙ্করণের প্রাচীর ও গেট। তার পর কাঁকর বিছানো বড় উঠোন। কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে উঠে একটা পরিসর। তার পর একটা হলঘর। তাকে ঘিরে ঐ পরিসর। পাশ ধরে বসার জায়গা। হলঘরের পর দুধারে প্রতিসাম্যে একাধিক ঘর। সেগুলোর সামনেও পরিসর। তেমনি তার পাশে বসবার জায়গা। পেছন দিকে গেলে দেখবো খোলা আকাশের তলায় একটা চাতাল। তাকে ঘিরে বসার জায়গা। সেখানেও ক্লাস হতে পারে। বাড়িটা দোতলা। এবার বাড়িটাকে মুখ করে পিছিয়ে এলে দেখবো নিচে যেমন তেমনি উপরে বারোটা করে থাম। একই Spacing এ একতলা আর দোতলার থামগুলো এমন একটা নকশা তৈরি করে যেটা মনে করাবে ফতেপুর সিক্রির দৌলতখানার খালওয়াৎ

খাদা বা সম্রাটের ব্যক্তিগত ঘরটাকে। চীন ভবনের বাঁদিকে হিন্দী ভবন। অনেক পরে তৈরি। তুলনায় আকারে অনেক ছোট। কিন্তু দুটো তলা, আর সমান Spacing-এ দুটো তলার থামের বিন্যাস ঐ দৌলতখানার কথাই মনে করাবে।

ইতিহাসের স্থাপত্য কীর্তি থেকে নানান উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগ্রহ হয়েছে শুধু নকশা নয়, আহৃত হয়েছে কোনো অঞ্চলের প্রচলিত কোনো পদ্ধতি ও টেকনিক। নন্দনের উত্তর দিকের বড় হলঘরটির উত্তর-পুব আর উত্তর-পশ্চিমে দেওয়ালের গায়ে বসানো হল দুটো ফাঁপা থাম। বাইরের হাওয়াকে তারা ঘরে নিয়ে আসবে। সেই হাওয়ার গতি সহজ করতে মেঝের স্তরে রাখা হয়েছিল ছোট দুটো জানালা। পদ্ধতিটা সিন্ধ বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আহৃত। ছাদের কেন্দ্রে একটা ফাঁক রেখে তৈরি করা হয়েছিল Sky Light। ছাত্র শিল্পীরা সেখান থেকে পাবে পরোক্ষ আলো। রবীন্দ্রনাথ নাকি দেখেছিলেন জাভার প্রাসাদে। রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন উপায়টা প্রয়োগ করার জন্য। নন্দলালের নিজের যে স্টুডিও কলাভবনে নন্দনের পেছনে, সেটাতে ঢোকবার একটাই দরজা। মধ্যের ঘরের এপাশে ওপাশে নানা ঘর। ছাত্রেরা এঘর ওঘর যে কোনো ঘরে যেমন যেতে পারে তেমনি নিজ ঘরে উপভোগ করতে পারে একটা নিভৃতি। জানালাগুলো খুব নিচু। জানালা থেকে বেরিয়ে ছোট ছোট দেওয়ালের উপর ঢাকা। ঘরের মেঝেয় বসে ছাত্রেরা যেমন আলো পায়, দেখতে পায় মাটি শিকড় থেকে আকাশ অবধি প্রকৃতি, বর্ষার রূপ। কিন্তু বাইরে এগোনো ঐ ঢাকাগুলোর জন্য বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগে না।

আমরা এতক্ষণ বলেছি ভবন দপ্তর প্রতিষ্ঠানের কথা। বিশ্বভারতীকে আরও যে সবের আয়োজন করতে হয়েছে তার মধ্যে আছে কর্মীদের, অধ্যাপকদের থাকার বাড়ি। আর অতিথি বা বেড়াতে আসা মানুষদের জন্য অতিথি ভবন। প্রথম পর্যায়ের নতুন বাড়িতে বাসরত অধ্যাপকেরা এক সময়ে গুরুপল্লীর সারিবদ্ধ খড়ের চাল মাটির বাড়িতে উঠে আসেন। একটা লেখায় পেয়েছি, সেই বাড়িগুলো করার জন্যে কর্তৃপক্ষই তাঁদের ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই বাড়িগুলিতে তাঁরা ছিলেন বেশ ক'দশক ধরে। পাঁচের দশকেও থেকেছেন কেউ কেউ। ইতিমধ্যে আরও কিছু বাড়ি তৈরি হয় সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনায়। পাকা বাড়ি। কিছু বাড়িতে দেখি ঘরগুলো ছোট, ছাদ একটু নিচু। চারপাশে খোলা জায়গা। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় লিখছেন "প্রত্যেক বাড়ির সামনে থাকতো খোলা বারান্দা এবং তারও সামনে থাকতো উন্মুক্ত চাতাল। সেই চাতালের বেষ্টনী হিসেবে থাকতো টানা বসবার বেদিকা। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সেই চাতাল মনোরম হয়ে উঠত। ..... অনাদিকাল থেকে আমাদের দেশে খোলা জায়গায় পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন যাপনের একটা রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল। গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়াই তার জন্য দায়ী।"[১২]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্যাট্রিক গেডেস-এর পুত্র আর্থার সুরুল ও আশেপাশের গ্রামে সমীক্ষা করেছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে বলেছিলেন অন্দরমহল, বহির্মহল আর একটা উঠোনের কথা। আর বলেছিলেন চণ্ডীমণ্ডপের কথা। আর্থার তাঁর সমীক্ষার

ছবি ভাগ করে নিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর সঙ্গে।

শিল্পপতি টাটা পরিবার থেকে একটা টাকা এসেছিলো। সেই টাকায় তৈরি হয় অতিথিনিবাস। রতন টাটার নামে রতন কুঠী। বাড়িটা অর্ধচক্রাকার। চারিদিকে বিস্তৃত প্রান্তর আর খোয়াই-এর সাযুজ্যে তার বিস্তারটা অনুভূমিক। সামনে একটা বড় ঘর অর্ধচক্রের কেন্দ্রে। দুদিকে তিনটে করে ঘর, অর্ধবৃত্ত অনুযায়ী একটার কিছুটা পেছনে আরেকটা। পাশাপাশি নয়। ফলে একটা ঘরের আলোচনা অন্য ঘরে প্রবেশ পায় না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর শান্তিনিকেতন বেড়াবার অভিজ্ঞতার বই 'সব পেয়েছির দেশে'তে বলেছিলেন সকলের জন্য যে খোলা বারান্দা তার কোথাও একজন শুয়ে থাকলেও আরেকজন তাকে দেখতে নাও পেতে পারে। একটা ঘরের আলোচনা অন্য ঘরে সহজে যেতে পারে না।

শুরুর দিকে যে প্রত্যয়গুলোর কথা বলা হয়েছিল তার মধ্যে দুটোকে এখানে স্মরণ করি। প্রথম শিল্প আর কারিগরির মধ্যে ছেদহীন ধারাবাহিকতা আর দ্বিতীয় প্রতিদিনের জীবনযাপনের আয়োজনে সৌন্দর্যকে স্থান করে দেওয়া। এই দুই-এর যোগে স্থাপত্যের সঙ্গে আসবাব নকশা আর নির্মাণ, বিশেষ করে কাঠের নানান ধরনের কাজ করা হয়েছিল। তার বেশিরভাগটাই বোধহয় উত্তরায়ণের বাড়িগুলিতে জাপানী কারিগর কাসাহারার তত্ত্বাবধানে। রতন কুঠীর খাবার জায়গার নিচু নিচু টেবল-এর সারি আর তার সঙ্গে নিচু চেয়ার। স্থাপত্যের সঙ্গে যেমন মিলেছে তেমনি নজরও কেড়েছে। সৌন্দর্য্যসঞ্চারে যুক্ত হয়েছিল আরো নানা ধরনের হাতের কাজ, যেমন তাঁত যেমন সেরামিক্স।

পরিবারের বাড়ির উঠোন বা বারান্দা যেমন, তেমনি প্রতিষ্ঠানেরই নানা জায়গায় ছোট ছোট পরিসর যেখানে সবাই বসতে পারে, আলোচনা আর আড্ডা দিতে পারে তার কথা বলেছিলাম Public Space প্রসঙ্গে। তারই একটা বিস্তৃতি — নাম দিনান্তিকা চা চক্র। গৌরপ্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছ কোণা একটা বাড়ি — দোতলা। নিচে আর উপরে একটা করেই ঘর। দোতলায় একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। মেঝে থেকে কিছুটা উঠে দেওয়াল বলে কিছু নেই। এক একটা কোণ অবধি এক একটা জানালা। সে অর্থে মহর্ষির কাচের মন্দিরের মত সবটাই জানালা, তাদের ধরে রাখার জন্য খানিকটা করে থাম। এটা অধ্যাপক কর্মীদের চায়ের আড্ডার আয়োজন। বিকেলের আলোয় চা সহযোগে আলাপচারিতার ব্যবস্থা। এক অর্থে প্রাচ্য ভাবনারই একটা বিস্তার। প্রতিবেদক তার কলেজ জীবনে দেখেছে, কর্মীসংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায় নিচে ঘাসের ওপর বিস্তৃতভাবে বসার ব্যবস্থা। অধ্যাপক কর্মীরা চা খাচ্ছেন।

এই অংশের শেষে উল্লেখ করি বিদ্যাঙ্গনের স্থাপত্য নিয়ে এই লেখা, তাই বাদ রাখা হয়েছিল ব্যক্তি আবাসগুলোকে — উদয়ন, উদীচি, কোনার্ক বা মালঞ্চ, অমিয় চক্রবর্তীর 'রাস্কা', অবনীন্দ্রনাথের "আবাস।" এক দিক দিয়ে এই এড়িয়ে যাওয়াটা — সেটা এই অংশের ক্ষতিই করেছে। যে কোনো বিদ্যাঙ্গনে থাকে একটা প্রশাসনিক কেন্দ্র। তখনকার বিশ্বভারতীতে সেটা কোথায়? উদয়ন বাড়িটা সেই কাজই করেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ স্মারক গ্রন্থে ক্ষিতিশ রায়ের প্রবন্ধে পাচ্ছি, "(Udayan) had been the Founder President's Office, Library, ... Committee Room, Hall of Audience and Reception, ... Teachers' Club and what not"[১৩]

কিন্তু এর বেশি আলোচনার সামর্থ্য এখানে এখন নেই।

ভিত্তিচিত্র

শান্তিনিকেতনে সুরেন্দ্রনাথ নন্দলাল যোগ দেবার সূত্রে, তার স্থাপত্যের সঙ্গে জড়িয়ে বিপুল সংখ্যায় ভিত্তিচিত্র বা Mural আঁকা হয়েছিল। বিষয়টা তাই স্বতন্ত্র আলোচনা দাবি করে। R. Sivakumar একটা ফর্দ তৈরি করেছিলেন, তাতে এই পর্বে পাই পঞ্চান্নটি কাজ।[১৪] মূল বিষয়ের অংশ হিসেবে তার সামান্য কটা দিকের উল্লেখের সুযোগ এখানে আছে।

মূল প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগের সূত্রে আমরা বলেছিলাম একটা প্রত্যয়ের কথা — সেটা শিল্প আর কারিগরির ছেদহীন ধারাবাহিকতায় একটা বিশ্বাস। এই সূত্রেই সুরেন্দ্রনাথের মত শিল্পীকে পাওয়া গেছে স্থপতির ভূমিকায়। সেই সঙ্গে পেয়েছি বিশ্বভারতীর নানান বাড়িঘরের দেওয়ালে নানান ধরনে নানান মাধ্যমে ভিত্তিচিত্র আর অলঙ্করণ। ছিল আরো একটা প্রত্যয় — শিল্পকে ম্যুসিয়মে নয়, প্রতিদিনের জীবনে স্থাপন করবার প্রত্যয়। শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যের সঙ্গে ভিত্তিচিত্রের এত মিলমিশ — দুই-এর এত সাযুজ্য সমকাল বা পরবর্তী যুগের ভারতে তেমন দেখা যায়নি। K.G.Subramanyan যেমন লিখছেন

The early Santiniketan murals work with, not against, the architecture and contribute to its personality, often transforming the total environment and making the site more exciting and intimate.[১৫]

ঐ মিলমিশের প্রসঙ্গে বলছেন পুরনো লাইব্রেরিতে striking instance of how a delicate interplay of colourful murals and surface of sandy plaster can bring building to life।[১৬] বলছেন দূর থেকে দেখলে মনে হবে বিরাট বিরাট স্তম্ভ আর ঢাকা বারান্দায় রঙের যেন লুকোচুরি খেলা চলছে।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যে শিল্পীরা শান্তিনিকেতনে যুক্ত হয়েছিলেন প্রথম থেকেই ভিত্তিচিত্রে একটা আগ্রহ তাঁদের তৈরি হয়েছিল। ১৯০৯ সালে নিবেদিতার প্রণোদনে যাঁরা অজন্তা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নন্দলাল আর অসিত হালদার। ১৯২১ সালে, কলাভবন তখন শুরু হয়ে গেছে, বাগগুহায় গিয়েছিলেন নন্দলাল আর সুরেন্দ্রনাথ। দুটি ভ্রমণই সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের মুগ্ধ করেছিল। কলাভবনের দায়িত্ব নেবার কিছুদিনের মধ্যে ১৯২২ সালেই কলাভবনের শিক্ষাক্রমে নন্দলাল ভিত্তিচিত্রকে স্থান করে দিয়েছিলেন।

উল্লেখ করেছিলাম শিবকুমারের ফর্দে ৫৫টি কাজের কথা। প্রথম দিকের কিছু কাজ তো হারিয়েই গেছে। কোথাও কোথাও আদতে বাড়িটাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

প্রথম যে ভিত্তিচিত্রের খবর পাই সেটা ১৯১৮-১৯ সালে আদিকুটীরে সুরেন্দ্রনাথের করা। (এর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে) 'অজন্তা টেকনিক'-এ করা কাজ।

সেই থেকে যে শুরু তার পর ভিত্তিচিত্রে কত রকম টেকনিকের যে ব্যবহার হয়েছে ! রিলিফে নানান কাজ কালোবাড়িতে। ১৯৩৫-৩৬ থেকে। আবার প্রায় ত্রিমাত্রিক রিলিফ স্কাল্পচার স্টুডিওর পাশে, আওরাঙ্গবাদের কাজের অনুসরণে, নৃত্যসভা । রামকিঙ্কর, প্রভাস সেন আর শঙ্খ চৌধুরীর কাজ। এর বিপরীতে রাখা যায় নন্দনের গায়ে প্রায় দ্বিমাত্রিক — গান্ধীর ডান্ডি মার্চ্ — নন্দলালের ছবির ভিত্তিতে শঙ্খ চৌধুরীর রচনা।

তেমনি দেয়ালচিত্রের নানান বৈচিত্র্য। অজন্তা থেকে ফিরে এসে নন্দলাল অজন্তার শিল্পীদের মাধ্যমটা বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা করেছিলেন সেখানকার দেওয়ালের ছেড়ে আসা আস্তরণ পরীক্ষা করে আর সমকালের প্রতিমা শিল্পীদের কাজ নিরীক্ষা করে। কলাভবনের একটা দেওয়ালে এক একটা স্তরে তুলি দিয়ে রঙ লাগিয়ে নন্দলাল তাঁর ধারণাটা নথীবদ্ধ করে রেখে গেছেন। আদিকুটীরের দেওয়ালে সুরেন্দ্রনাথের কাজটার উপায়কে বলা হয়েছিল 'অজন্তা টেকনিক'। কিন্তু বাড়িটাই নেই, তাই জানা যাচ্ছে না কী ছিল সেই টেকনিক। যে পদ্ধতিটা পরে খুব ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হল 'ভেজা' ফ্রেস্কো। ব্যবহার হয়েছে শ্রীনিকেতনে নন্দলালের 'হলকর্ষণ' কাজটায়। হিন্দী ভবনে বিনোদবিহারীর 'মধ্যযুগের সন্ত'দের নিয়ে কাজে। তারই একটা বৈচিত্র egg tempera। চীন ভবনে বাগগুহার অনুকরণে "মার এর হাতছানি" বা ঐ বাড়িরই দোতলায় বিনোদবিহারীর 'আশ্রমজীবন' কাজে। রাজস্থান থেকে ডেকে আনা হয়েছিল নরসিংলালকে — তাঁর কাছে নন্দলাল আর ছাত্রেরা শিখেছিলেন 'জয়পুরী টেকনিক'। নন্দলাল সেটাকে ব্যবহার করেছিলেন গ্রন্থাগারের গায়ে 'চৈতন্যর জন্ম' কাজটায় আর তার দুদিকে ছড়ানো কাজগুলোতে।

বলা হচ্ছে বিনোদবিহারী পান্থশালার ছাদে কাজ করেছিলেন 'তেল মাধ্যমে'। কিন্তু সেই কাজ এখন আর নেই। তা ছাড়াও একাধিক ধ্রুপদী উপায়কে মিলিয়ে মিশিয়ে কাজ করবার কথা শোনা যায়।

পশ্চিম থেকে এসেছিল ফ্রেস্কো পদ্ধতি (তাকে খানিক 'দেশীকৃত' করা হয়েছিল)। কিন্তু নন্দলাল ব্যবহার করেননি তার রঙ। নন্দলালের পছন্দ জৈব বা অজৈব দেশী রঙ। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা সাদার বদলে খড়ি, হলুদের জন্য দু ধরনের এলামাটি, গন্ধক, হরিতাল, লালের জন্য লাল গেরিমাটি আর লাক্ষা, সবুজের জন্য 'হারা', জাংগাল বা Copper Oxide, নীলের জন্য Lapis Lazuli আর Indigo, কালোর জন্য ত্রিফলা আর ভুষোকালি ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন।[১৭]

বিষয়ের মধ্যে রয়েছে কখনো পুরাণ, যেমন কালোবাড়ির গায়ে 'শিবের বিবাহ', কখনো পুরনো কাজের কপি — অজন্তা, বাগ বা আওরাঙ্গাবাদ, ইজিপ্ট এসিরিয় পারস্যচিত্রের কোনো অংশ, জীবজগৎ, শান্তিনিকেতনের আশপাশ, রবীন্দ্রনাথের লেখা কোনো নাটক — শাপমোচন বা নটীর পূজা, আর ইতিহাস। এখানে

সামান্যভাবে তিনটে কাজের উল্লেখ করা যায়।

প্রথম, কলাভবনের উত্তর পশ্চিম কোনার হস্টেলে চৈত্যের আদলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দার ছাদজুড়ে যে ছবিটা আছে সেটা বীরভূমের গ্রামের ছবি। বিনোদবিহারীর রচনা। ইজিপ্টের প্রাচীন একটা রূপকল্পের কাঠামো। মধ্যে ঝকঝকে একটা পুকুর। গাঢ় লাল রঙের মাটি, সবুজ পাতা, মাথায় খ্যাঙরা ঝুপড়ি গাছ, জ্বলজ্বলে একটা দুটো ফুলের ডাল, কুকুর, গাধা, গরু, মোষ, হনুমান, শুয়োর, বক, হাঁস, কাজে ব্যস্ত বিশ্রামে রত গ্রামের মানুষ, সাঁওতাল ব্যাধ — শিবকুমারের মতে "যেমন বিচিত্র তেমনি বুনোটময়। একটা মোটিফ থেকে আরেকটাতে যেতে যেতে সেটা ক্রমে উন্মোচিত হতে থাকে। পলে পলে তাকে ভঙ্গুর পথে উপলব্ধি করতে হয়।"[১৮]

দ্বিতীয়টা, লাইব্রেরির একতলার বারান্দায় নন্দলালের কাজ। ১৯৩৩ সালে নরসিংলাল আর ছাত্র কর্মীদের সহায়তায় তিনি করেছিলেন। পূর্বোক্ত বিনোদবিহারীর কাজ থেকে তার রঙ অনেক বেশি উষ্ণ, Saturationও বেশি। জয়পুর পদ্ধতিতে করা। পাঁচটি অনুভূমিক আর দুটি উল্লম্ব প্যানেল। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দেওয়ালের উপরিভাগ জুড়ে। কেন্দ্রে 'চৈতন্যের জন্ম', তার দুদিকে দুটো অনুভূমিক প্যানেল। বাঁদিকে শাপমোচনের অভিনয়, ডানদিকে বিদ্যাঙ্গনের দৈনিক জীবন। তাদের ওপরে আবার দুটো অনুভূমিক প্যানেল। বাঁদিকে রিক্ত খোয়াই দিগন্তবিস্তৃত। ডানদিকে রাখাল আর চরে বেড়ানো গরুর দল। একদম বাঁদিকে আর ডানদিকে দুটো উল্লম্ব প্যানেল। বাঁদিকেরটা নটীর পূজায় নটীর শেষ নাচ, আর ডানদিকের প্যানেলে একটি সাঁওতাল মেয়ে। সে কি দেয়ালে আলপনা দিচ্ছে? এত বিচিত্র বিষয় আর Style — সুব্রমন্যনের মনে হয়েছে 'Patchwork Quilt'।[১৯] কিন্তু পুরোটাকে একটা ঐক্যে ধারণ করে আছে রঙের সুন্দর সমন্বয়। একজন মাস্টার শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

শেষে উল্লেখ করবো হিন্দী ভবনের দেওয়ালে তিন দেওয়াল জুড়ে বিনোদবিহারীর কাজ। এই কাজটি সম্ভবত একটিই কাজ যেটা কোনো ভবনের orientation টাকে চিহ্নিত করে দিয়েছিল। মনে পড়তে পারে এই কাজটা সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন বিংশ শতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ঠ সার্থক সৃষ্টি। বিষয় মধ্যযুগের সন্ত। খেয়াল করা যায় হিন্দী ভবনের নেতৃত্বে তখন হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী। হাজারিপ্রসাদ মধ্যযুগের প্রধান এক সন্ত কবীরের ওপর গবেষণার নেতৃত্বে তখন। শিবকুমার বলছেন, বিনোদবিহারী আঁকছেন তিন দেওয়াল জোড়া চালচিত্রে যেখান থেকে উঠে আসে বিভিন্ন ধারাতে প্রবাহিত অথচ সংহত একটা সংস্কৃতির রূপ। আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে নতুন পন্থার পথিকৃৎ, ভক্তি আন্দোলনের মন্ত্রবর্জিত নেতা আর তার জঙ্গি সংস্কারকদের সঙ্গে নিয়ে ভিত্তিচিত্রটা ক্রমশ এগিয়ে যায় গ্রামজীবনের দিকে তার নামহীন আউল বাউলদের দিকে। এগিয়ে যায় দুই তীরের প্রাণবন্ত আর ক্রমে বিচিত্রতর হয়ে ওঠা জনপদের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা নদীর মত।

আমরা আগেই বলেছি যে নন্দলালের অধ্যক্ষতায় কলাভবনের পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়েছিল ভিত্তিচিত্র রচনা। ছাত্ররাও শিক্ষকদের সঙ্গে যোগ দিতেন প্রকল্পগুলোয়।

কখনো শিক্ষকদের মূল কাজের অংশ রচনায়। বিনোদবিহারীর হিন্দী ভবনের ভিত্তিচিত্রের উত্তর দেওয়ালের ঘোড়া যেমন তাঁর ছাত্র সুব্রমন্যনের কাজ। কখনো সম্পূর্ণ একটা কাজ। সন্তোষালয়ের উত্তর দিকের দেওয়ালে যেমন সিমেন্ট রিলিফ 'কচ ও দেবযানী'। শিল্পী দুই ছাত্র — রামকিঙ্কর বেজ, সুধীর খাস্তগীর। বেশির ভাগ সময়েই ছাত্ররা করতো ছোট ছোট প্যানেল। কলাভবনের তারুণ্যের দিনে এই যোগদানটা ছিল উৎসবের মত। নন্দলালের কন্যা যমুনা তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণে বলছেন, "যখন শিশু বিভাগে (আজকের সন্তোষালয়) ফ্রেস্কো করা হল — ওই ফ্রেস্কো করাটাই পুরো কলাভবনের একটা প্রজেক্ট। সমস্ত ছাত্রছাত্রী শিক্ষকরাই সেই কাজে যুক্ত। সারাদিন ধরে জমজমাট। কাজ হচ্ছে, গান হচ্ছে, মাসোজী এস্রাজ বাজাচ্ছেন।"[২০]) এই ভিত্তিচিত্রের কাজের সূত্রেই সবাই না হলেও বিশ্বভারতীর ছাত্রদের একাংশ যুক্ত হোত, একাত্ম হতে পারতো শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য রচনায়।

কালোবাড়ী

লেখাটা এর আগেই শেষ হয়ে যেতে পারতো। হয়নি, তার কারণ কালোবাড়ী। এতক্ষণের আলোচনায় সেটা আসেনি। কারণ সেটার এক ধরনের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। ফলে লেখায় কালোবাড়ী একটা স্বতন্ত্র উপস্থিতি দাবি করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় যে 'স্বদেশ' সেখানে গ্রাম দেশের মাটির বাড়ির অবস্থান। এই গ্রামীণ সাবেকী কারিগরিটাকে সমকালের জীবনে কী ব্যবহার করা যায় সেই প্রশ্ন নিয়ে প্রথমে দেখেছি চৈত্যর উদ্যোগ। পথের ধারে চৈত্যের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাটির বাড়ি নিয়ে দ্বিতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা কালোবাড়ী। (অবশ্যই ইতিমধ্যে উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে তৈরি হয়ে গেছে শ্যামলী)। চৈত্যের বৈসাদৃশ্যে আকারে বিরাট এই বাড়ি তৈরি হয়েছে ছেলেদের হস্টেল হিসেবে। প্রধান উদ্যোগী নন্দলাল আর রামকিঙ্কর। কিন্তু সম্ভবত মহাত্মাজীর ডাকে নন্দলাল ব্যস্ত হয়ে পড়লে রামকিঙ্কর এটার অলঙ্করণ পরিকল্পনা আর প্রয়োগে বিশেষভাবে ভূমিকা নেন।

মাটির দেওয়াল, ঘরের ভেতরের দেওয়াল গোবর লেপা, বাইরের দেওয়াল সম্পূর্ণ আলকাতরায় ঢাকা। মেঝেতে সিমেন্টের ঘোলা। এই বাড়ির জন্য মাটি তৈরি করতে হয়েছিল বিশেষভাবে। ওপরকার জমির দু ফুট তলা থেকে মাটি নেওয়া হয়েছে। মেশানো হয়েছে গোবর আর আলকাতরা। তারপর সেটাকে গেঁজাতে দেওয়া হয়েছে। পায়ে দলে দলে করা হচ্ছে নমনীয়। মেশানো হচ্ছে পাটের টুকরো। সমস্ত দেওয়ালগুলো তৈরি আর শিল্পরচনার পরে শেষ হলে আলকাতরা প্রলেপ। জানাচ্ছেন শোভন সোম।[২১] শ্যামলীর মত প্রথমে এটারও ছাদ তৈরি হয়েছিল মাটি দিয়ে। কিন্তু বছর দুয়েকে তার খানিকটা ভেঙে পড়লে পুরোটাকেই খড় দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হয়।

পুবে-পশ্চিমে বিস্তৃত এই বড় বাড়িটা আসলে পরপর তিনটে বর্গক্ষেত্রকে জুড়ে তৈরি। প্রতিটি ক্ষেত্রে দুটো করে ঘর। মধ্যের বর্গ সব থেকে উঁচু। পশ্চিম থেকে পুবে এগোলে দেখবো প্রতিটা পরের বর্গ আগেরটা থেকে কিছুটা উত্তরে এগোনো। তারপর পুবদিকে ঢাকা একটু বারান্দা, তারপর একটা চাতাল। বাড়িটার দক্ষিণ ধরে পুবে পশ্চিমে সমান্তরাল একটা করিডোর। ঘরগুলো একই সরলরেখার উপর না থাকায়, তাদের সরে সরে যাবার জন্য করিডোরটা নিয়েছে একটা zigzag চেহারা। করিডোরটার ডানদিক ধরে তথা দক্ষিণ দিকে কিছুটা দূরে দূরে মাটির চওড়া আড়াল। আড়ালগুলো থামের থেকে চওড়া কিন্তু দেওয়ালের থেকে ছোট। এগুলো ছাত্রদের সত্যিই একটা আড়াল দিতে পারে। সূর্যের দৈনিক পরিক্রমায় আলোর একটা লুকোচুরি খেলা ঘটে যায়। আর ঘরগুলো একটু একটু করে এক পাশে এগোনো বলে, রতন কুঠীতে যেমন দেখেছি করিডোরের এক একটা পরিসরে বসলে পাশেরটা থেকে একটা নিভৃতি উপভোগ করতে পারে ছাত্রেরা।

এবার দেখা যাক তার শিল্পরূপ। কুচকুচে কালো আলকাতরায় মোড়া বিস্তৃত একটা বাড়ি। চোখ তো টানবেই। সামনে পেছনে অনেকখানি করে পরিসর। ঐ পরিসরে ঐ বাড়ির monumentalityটা অনুভব করা যায়। বাড়ির মধ্যের বর্গক্ষেত্রের জোড়া ঘরটা তো খুবই উঁচু। কিন্তু পুবে পশ্চিমে তার বিস্তার বাড়িটাকে দিয়েছে অনুভূমিকতা। বিপুলতা সত্ত্বেও বাড়িটা মুক্ত আকাশের গায়ে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। (প্রাসাদোপম উদয়ন বাড়িও তেমনিই অনুভূমিক একটা অট্টালিকা)।

বাড়িটার দক্ষিণ দেওয়াল বরাবর রিলিফ কাজের অনেকগুলো প্যানেল। সম্ভবত ১১টা কাজ। বিষয় শিবের বিবাহ। অনুপ্রেরণা কোচিনে মাতানেচ্চেরী মন্দিরের দেওয়ালচিত্র। (মন্দিরের ঐ ভিত্তিচিত্র কপি করার কাজে তার আগে যুক্ত ছিলেন কলাভবনের দুজন প্রাক্তনী)। করিডোরের দক্ষিণে যে আড়ালগুলো — সংখ্যায় ১৫টা, তার ১৪টায় একটা করে অবয়ব বা মূর্তি। নাচ গান বাজনার শিল্পী। আর বাউল, আর বাঁক কাঁধে মিষ্টিওয়ালা। 'শিবের বিবাহ'র প্যানেলগুলোয় স্টাইল-এর একটা একতা ছিল, এগুলোতে তা নেই। বিভিন্ন জনের কাজের বৈচিত্র্য বোঝা যায়। উত্তর দিকে যে দেওয়াল — তিনটে বর্গক্ষেত্রের প্রতিটার বাইরের দিক, তার মধ্যে মধ্যিখানের দেওয়ালটা সব থেকে উঁচু (কারণ সেটাই সব থেকে উঁচু ঘর), তাতে উপস্থিত প্রকৃতি। দেয়ালটা উঁচু বলে স্থান করতে পেরেছে তাল গাছ, খেজুর গাছ তাদের মাথায় পায়রার ওড়াউড়ি। খেজুর গাছে বাঁদর। অদ্ভুত একটা উট। আর হুঁকো হাতে এক বানরওয়ালা। সেটি বনকাটির রথের একটা ইমেজ থেকে নেওয়া। এই বাড়িতেই বনকাটির সূত্রে আরও একাধিক ইমেজ আছে। পশ্চিমমুখো দুটো দেওয়াল, তাদের একটার গায়ে হরপ্পার ষাঁড়, অন্যটার গায়ে তীরবিদ্ধ এসিরিয় সিংহ। কোনোটাই হুবহু অনুকরণ নয়। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে আছে ভরহুত, খাজুরাহো, পল্লবমূর্তির এক ধরনের নবীকরণ। এক প্রাক্তন অধ্যাপকের মনে হয়েছে এ যেন art historyর মধ্যেই ছাত্রদের বাস করবার আয়োজন।

প্রয়াত তরুণ গবেষক পারভেজ কবীরের মনে হয়েছিল ভারতীয় প্রাচীন রূপকল্পের সঙ্গে ইজিপ্সিয় অবয়ব এসিরিয় সিংহকে যুক্ত করে দেশটাকে যেন যুক্ত করা হল প্রাচ্যের ভাবনার যে ভূগোল তার পশ্চিম তথা মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে।[২২]

জানি এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা স্থাপত্যটার প্রতি সুবিচার করবে না। তবু শেষ করি একটা গল্প দিয়ে। বিশ্বভারতীতে মাটির বাড়ি করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর তবু কালোবাড়ী তৈরি করা হল। রবীন্দ্রনাথের কাছে নালিশ। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছেন নন্দলালের কাছে। ভাবলেন দেখে যাই বিতর্কিত বাড়িটা। দেখলেন, কিন্তু নালিশটা করা হল না। কারণ, তিনি বলছেন

"I am not aware if in any academic institutions anywhere else in the world there is a comparable example of collective effort from the teachers and students."[২৩]

***

শান্তিনিকেতনের বিদ্যাঙ্গনের স্থাপত্যের যে বিকাশ তাতে দেখছি কিছু নকশা স্থিরতা পেয়েছে। এক, ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা তারপর হলঘর। বাসগৃহর সঙ্গেও একটু বারান্দা একটু চাতাল। দুই, সব জায়গাতেই যতটা পারা যায় ফাঁকা পরিসর। তিন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু কিছু ইডিয়ম। 'ছাজ্জালার' তলায় ব্র্যাকেট। বাইরের দেওয়ালে কার্নিস। কোথাও ফতেপুর সিক্রির মত একটু ঢাল ওয়ালা কার্নিস। বাইরের দিকে অথবা দরজায় Stepped arch আর Corbelling। দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গি। আর জালির কাজ (বিচিত্রা — শান্তিনিকেতন)। নিরাভরণ বাড়িগুলোর গায়ে সেগুলোই সামান্য ছোট ছোট অলঙ্করণ। আর তলভাঙ্গা মেঝে।

ফাঁকা পরিসর দিয়েছে প্রকৃতিকে অবকাশ। বাড়িগুলোর সাধারণভাবে অনুভূমিক গতি পরিসরকে করেছে আরও ব্যাপ্ত বাধাহীন। এই অনুভূমিকতাটা সম্ভবত এসেছে জাপানের ডিজাইন থেকে। জাপান বা জাভার ডিজাইন যদি স্থাপত্যটাকে দূর প্রাচ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, ভিত্তিচিত্রের এসিরিয় সিংহ বা ইজিপ্টের পুকুরের নকশা তাকে পশ্চিমদিকে নিয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে।

কেন এত আয়োজন? দেশের ঐতিহ্য — নাগরিক আর গ্রামীণ -কে স্বীকৃতি ও স্থান করে দেওয়া যেমন ছিল, তেমনি ছিল প্রকৃতিকে জনপদের জীবনে স্থাপন করা। ভারতের ঐতিহ্য থেকে আহরণ করেছেন, কিন্তু বিশুদ্ধতার কোনো শুচিবায়ুতে ধরা দেননি। লক্ষ্য ছিল নন্দলাল যেটাকে বলেন মধ্যবিত্তের খেলো জাপানি পুতুলের রুচি সেটাকে একটু ধাক্কা দেওয়া । আধুনিক শহরের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ সেগুলো — Show no faces but merely masks। তাকে মানবিক করা, প্রচুর ভিত্তিচিত্রের আয়োজন করে সুন্দরের আবাহন। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃভাবের কোনো আয়োজন Public Space-এর বয়ানে।

আরেকটা উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই কোথাও কারো মনে একভাবে ছিল। কলাভবন

হস্টেলের ছাদে বিনোদবিহারী আর তুলনায় হয়তো ততটা বিস্তৃতভাবে নয়, লাইব্রেরির বারান্দায় নন্দলাল এঁকেছিলেন গ্রাম জীবনের ছবি। (বিনোদবিহারীই তো প্রথম খেয়াল করেছিলেন যে নন্দলাল আর তাঁর ছাত্রদের শিল্পচর্চা বাংলা ঘরানার পুরাণ আর ইতিহাসের পরিসর থেকে ক্রমশ এগিয়ে গেছে মাটির দিকে, প্রতিবেশী জীবনের দিকে।) হিন্দীভবনের দেওয়ালে ও বিবৃত জীবনের প্রবাহ।

তার প্রায় তিন দশক বাদে সাতের দশকের গোড়ায় কলাভবনের ম্যুরাল হলের উত্তরের বাইরের দেওয়ালে বিনোদবিহারী করেন টাইল্স্ দিয়ে একটা ম্যুরাল। বাঁক কাঁধে মানুষ, হাটের দোকানী, বাদামওয়ালা, কীর্তন গায়ক, ঝুড়ি মাথায়, ছেলে কাঁধে মানুষ। চলন্ত জীবন।

বলেছিলেন "ওরা আসবে যাবে দেখবে আর বুঝবে এটা ওদেরই ছবি।"

***

এই লেখাটা তৈরি করতে সাহায্য নিতে হয়েছে একাধিক বই ও বন্ধুর।

বইগুলি হলো

নন্দলাল বসু র "দৃষ্টি ও সৃষ্টি"

R. Siva Kumar এর "Santiniketan : Contextual Modernity"

Jayanta Chakrabarty, R. Siva Kumar Arun Kumar Nag সম্পাদিত "The Santiniketan Murals"

Samit Das এর "Architecture of Santiniketan : Tagore's concept of space"

শোভন সোম সম্পাদিত "রবীন্দ্রপরিকর সুরেন্দ্রনাথ কর"

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এর "শান্তিনিকেতন স্থাপত্য পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ"

Sanjay Basu Mallick সম্পাদিত "Kalo Bari / কালোবাড়ী"

অমিত দত্ত ও এই লেখক সম্পাদিত "কলাভবনের কথা"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিশ্বভারতী"

১) দ্রষ্টব্য দীপংকর চট্টোপাধ্যায় এর প্রবন্ধ - "পরিবেশের সশ্রদ্ধ রূপকার"। শোভন সোম সম্পাদিত বই-এ সংকলিত।

২) পুর্বোক্ত বই-এ সুরেন্দ্রনাথ কর-এর "স্মৃতিচারণ"

৩) R. Siva Kumar-এর উল্লিখিত বই থেকে।

৪) সুরেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৫) R. Siva Kumar-এর পূর্বোক্ত বই।

৬) দ্রষ্টব্য শোভন সোম সম্পাদিত পুর্বোক্ত বই-এ ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মনের প্রবন্ধ।

৭) শোভন সোম সম্পাদিত বই-এ সব্যসাচী ভট্টাচার্যর প্রবন্ধ "সুরেন্দ্রনাথ করের কলাকৃতি"।

৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নে উল্লিখিত বই-এর প্রথম প্রবন্ধ।
৯) সব্যসাচী ভট্টাচার্যর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।
১০) সুরেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।
১১) বক্তৃতাটি স্থান পেয়েছে তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টি বইএ।
১২) দীপংকর চট্টোপাধ্যায়-এর পুর্বোক্ত প্রবন্ধ
১৩) শোভন সোম সম্পাদিত পূর্বোক্ত বই-এ ক্ষিতীশ রায়-এর প্রবন্ধ।
১৪) Jayanta Chakravarty প্রমুখ সম্পাদিত বই-এ সংকলিত।
১৫) উপরোক্ত বইয়ে K. G. Subramanyan-এর foreword
১৬) উপরোক্ত রচনা।
১৭) Jayanta Chakravarty প্রমুখের বই-এ Arun Nag-এর প্রবন্ধের উৎসে
১৮) Siva Kumar-এর পুর্বোক্ত বই।
১৯) K. G. Subramanyan-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।
২০) অমিত দন্ড প্রমুখের 'কলাভবনের কথা'য় যমুনা সেন-এর প্রবন্ধ।
২১) Sanjay Basu Mullick সম্পাদিত বই-এ শোভন সোম-এর প্রবন্ধ।
২২) Sanjay Basu Mullick সম্পাদিত বই-এ Parvez Kabir-এর প্রবন্ধ
২৩) Sanjay Basu Mullick সম্পাদিত বই-এ সম্পাদকের ভুমিকা